বুদ্ধমূর্তি ও প্রত্নসম্পদে সরকারের মস্তক বিক্রয়

সোনা কান্তি বড়ুয়া

জনতার ক্ষোভ এবং প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করেই সরকার বাংলাদেশের প্রাচীন দুর্লভ বুদ্ধ মূর্তিসহ বিভিন্ন প্রত্নসম্পদ ফ্রান্সে পাঠিয়ে তাদের আমলাদের মস্তক বিক্রয় করেছে দিনের পর দিন। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার "সরকার জনতার জন্যে এবং জনতার দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি"এর অর্থই বোঝে না। তাইতো জিয়া বিমানবন্দরের হাটে হাঁড়ি ভেঙে পবিত্র দুইটি পরম পূজ্য বুদ্ধমূর্তি (ভোরের কাগজ ডিসেম্বর ২৬, ২০০৭ সালে গৌতমবুদ্ধের আবক্ষ মূর্তি ও বজ্রশক্তি বোধিসত্বের মূর্তি) বা বিষ্ণুমূর্তি হারিয়ে যাবার পর সরকারের টনক নড়েছে। ভুল সবই ভুল। অতি দর্পে হত লংকা। বাপ দাদার আমলের মহামূল্যবান প্রত্নসম্পদ চুরি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাফিয়া চক্রের দুর্নীতিতে সাহেব বিবি গোলামেরা জড়িত থাকার কথা বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আজ থেকে একবছর আগে দুর্নীতি বধে পাঁচালির সংকীর্তন ও ভাটি গানে নেচে গেয়ে যে সরকারের যাত্রা শুরু হয়েছিল "চল রে চলের দামামা বাজিয়ে" সেই সরকারের আমলাদের অবস্থা লেজে গোবরে কেন? ছি: তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছি:। কথায় বলে, "যত গর্জে তত বর্ষে না।"

এই প্রসঙ্গে ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বুদ্ধমূর্তিকে বিষ্ণুমূর্তি বলার কারণ কি? দেশের জনতা বুদ্ধমুর্তিকে খুব ভালোভাবে চেনেন। সরকারী আমলারা টাকার লোভে অন্ধ হয়ে বাংলাদেশের হৃদয় থেকে দুর্লভ মহামূল্যবান প্রত্নসম্পদ ছিনে নিয়ে বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রয় করে। ঢাকা জাতীয় যাদুঘরের ডিরেক্টার জেনারেল কি লাঠির আগায় বাঁধা বিষ্ণুর নবম অবতার গাজরটিই কি দেশকে ভুলিয়ে দিচ্ছে গৌতমবুদ্ধের বাংলাদেশের কথা? অনেকের মতে, বুদ্ধমুর্তি চুরি হয়ে গেছে প্রচার হলে পররাষ্ট্র নীতিতে লঙ্কাকান্ড বাধাবে। সম্প্রতি ঢাকা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন উক্ত মহামূল্যবান বজ্রাসন ধ্যান মূদ্রায় ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি, পাঁচশত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা দীর্ঘ প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের হস্তলিখিত পবিত্র বৌদ্ধ ত্রিপিটক গ্রন্থ সহ প্রাচীন বাংলার মহামূল্যবান প্রত্নসম্পদ দেশের বাইরে প্রাচার করা বাংলাদেশের সংবিধান বর্হিভূত রায় ঘোষণা করা হয়।

তবু ও রাজনীতির মস্তক বিক্রয় করে ত্রিশে নভেম্বর, ২০০৭ সালে ঢাকা জাতীয় যাদুঘর, পাহাড়পুর, মহাস্থনগড়, ময়নামতি ও বরেন্দ্র রিচার্স যাদুঘরের একশ সাতাশটি

প্রত্নতাত্ত্বিক সমূহ পূরাকীর্ত্তি ফ্রান্সের 'গিমে ন্যাশেলন মিউজিয়াম অফ্ এশিয়ান আর্টস গ্যালারিতে' পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রানালয়ের সাথে ফ্রান্স দূতাবাসের চুক্তি অনুসারে। মন বলে আমরা তত্ত্বাধায়ক সরকারের মনের কথা জানি না। দেশ বিদেশের নানা স্বপ্নের অলিতে গলিতে তাহারা ঘুরে বেড়ায়। দেশের মাটিতে বসে দেশবাসীর 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার চিন্তা করার সময় এই সরকারের নেই।

অতীশ দীপংকর (৯৮২ - ১০৫৪)উক্ত প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রকে অবলম্বন করে তাঁর মহাপ্রয়াণ অবধি প্রায় তের বছর পর্যন্ত (১০৪২ - ৫৪ খৃষ্ঠাব্দ) তিব্বতের বৌদ্ধ সাহিত্যে আশিখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ২য় শতাব্দীতে মহাপন্ডিত নাগার্জুন ৬ষ্ঠ পারামিতা বা বুদ্ধত্ব লাভের পন্থা ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন মহাগম্ভীর মহাযান সূত্র নিয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র সম্পাদনা করেন। তন্মধ্যে (১) অষ্ঠারিকা প্রজ্ঞাপারমিতা (২) হীরক সূত্র (বিশ্বের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ) (৩)হৃদয় সূত্র (৪) বজ্রচ্ছেদিকা বা ডায়মন্ড সূত্র সহ সর্বমোট দুইলক্ষ শ্লোক আছে। যেই দেশে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের স্রোতধারা বা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র বিরাজমান অথচ আমরা "চিনির বলদ চিনি টানি, চিনি না চিনি।" মহামূল্যবান প্রত্নসম্পদ চুরি ও চিনির বলদের মতো সরকারের দায়িত্ববোধে আঘাত লেগেছে আজ। ইতিহাসের আলোকে দেশে প্রজ্ঞাপারমিতার ঝর্ণাধারা আজ ও বিরাজমান।

মানবিক অধিকার ও দায়িত্ববোধে আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের বুদ্ধমূর্তিকে বিষ্ণুমূর্তি নামকরণের অধিকার কারো নেই। ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস (১৯৪৮, হিন্দু সমাজে নেই) বা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ধারাগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মনে আছে কি? "সব মানুষই মুক্ত অবস্থায় সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারা বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন। ভ্রাতৃত্বসুলভ মনে পরস্পরের সঙ্গে আচরণ করা উচিত।" কিন্তু ভারতে আজ ও বৌদ্ধদেরকে হিন্দু বলে কোর্টে ম্যরেজ সার্টিফিকেট দেয়া হয়।

ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক ও কবিগণ (কবি জয়দেব) গৌতমবুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতার নামকরণ করে বৌদ্ধদের মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করেছেন। বৌদ্ধদের অস্তিত্ব রাতারাতি হিন্দু শাসক ও ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ লুট করে নিয়ে গিয়ে রামায়ণের অযোধ্যা অধ্যায়ের বত্রিশনম্বর শ্লোকে বুদ্ধকে গালাগাল দিয়ে মানবতার অপমান সাধন করেছেন। "প্রত্যেকেরই জীবনধারণের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার" বৌদ্ধধর্মে বিরাজমান। কোন সাহসে বৈদিক ইন্দ্ররাজা সহ ব্রাহ্মণসমাজ মহেঞ্জোদারো হরোপ্পার সিন্ধুসভ্যতায় প্রাগৈতিহাসিক বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস করে বৈদিক সভ্যতা স্থাপন করার পর বৌদ্ধধর্মকে হিন্দু ধর্মের শাখা বলার ধৃষ্ঠতা দেখায়? অথচ বৈদিক দেবতাদের মধ্যে প্রধানতম হলেন ইন্দ্র। "যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম" নামক (প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা সম্পাদিত) গ্রন্থে পল্লব সেনগুপ্তের লেখা "ধর্ম ও ভারতবর্ষ :আদিপর্বের রূপরেখা" প্রবন্ধে আমরা পড়েছি, " ইন্দ্ররাজাকে যুযুধান আর্যভাষী নায়করূপে দেখা যায় যিনি : (ক) শতদ্বারযুক্ত প্রস্তরনির্মিত নগরীসমূহ ভস্মসাৎ করেছিলেন; (খ) হরিযুপীয়া (হরোপ্পা) নগরের উপকণ্ঠে দাসবংশীয় রাজন্যবর্গ ও সৈন্যদেরকে ধ্বংস

করেছিলেন; (গ) মুরদেবাঃ- শিশ্নদেবাঃদের নগরী লুণ্ঠন করেছিলেন; (ঘ) দাসরাজাদের পুরনারীদেরকে গণধর্ষণে বিধ্বস্ত করার নেতৃত্ব করেছিলেন; (ঙ) স্বয়ং ঊষাদেবীকে ধর্ষণ করেছিলেন; (চ) বৃত্র নামক ত্রিশীর্ষ অসুরকে বধ করেছিলেন; (ছ) কৃষ্ণত্বক দাস-অহি বংশীয়দের পৃষ্ঠত্বকউন্মীলন করেছিলেন; (জ) দাসবংশীরা গর্ভিনী নারীদের হত্যা করেছিলেন; (ঝ) যতি-দের (বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বোধিসত্বদের) নিধন করে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন।"

এইভাবে প্রাগৈতিহাসিক বৌদ্ধ সভ্যতা, সংস্কৃতি, (স্বপন বিশ্বাসের লেখা "মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পায় বৌদ্ধধর্ম) ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং সিন্ধুসভ্যতায় বৌদ্ধ বাতাবরণের অস্তিত্ব সমূলে ধ্বংস করে প্রাচীন ভারত উপমহাদেশে ব্রাহ্মণদের আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুখ্যবৈদিক দেবতা (প্রায় তিনশ সুক্ত তারই উদ্দ্যেশ্যে নিবেদিত) ইন্দ্র রাজারই মাহাত্ম্য যদি এই হয়, তাহলে বৈদিকধর্ম চিন্তা সম্পর্কে অনুরক্ত বোধ করার কোন কারণ সম্ভবত নেই। উনংিশ শতাব্দীতে বৌদ্ধভিক্ষু দামোদর ধর্মানন্দ কৌশাম্বী উষাদেবীকে হরোপ্পা বা সিন্ধুসভ্যতার মাতৃদেবতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমাদের মতে একাত্তরের নয়মাসের পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের দুইলক্ষ মা-বোনের ধর্ষণ এবং ত্রিশলক্ষ নর-নারীর হত্যার এক সাগর রক্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই দেশের জনতার দাবী গৌতমবুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার নয় এবং বুদ্ধমূর্তিকে বিষ্ণুমুর্তি বলা বা লেখা ঐতিহাসিক অপরাধ। বাংলাদেশের গৌরব, বাঙালির সর্বকালের আলোকমালা সেই দুর্লভ পূজনীয় প্রত্নসম্পদের প্রতি আজ আমাদের মস্তক সশ্রদ্ধায় আনত হয়ে আসছে।